১২

সামাজিক ন্যায়নীতির তত্ত্ব : একটি রূপরেখা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

এক ॥ ভূমিকা

নৈতিকদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে ন্যায়নীতি (জাস্টিস) সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হয় খ্রিস্টজন্মের প্রায় চারশো বছর আগে প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকদের চিন্তায়। সমাজে বিভিন্ন শক্তির ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখলে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল সাধিত হতে পারে এবং সেই শক্তিসাম্যের স্বরূপই বা কী এই সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট দিকনির্দেশ পাওয়া যায় প্লেটো ও আরিস্টটলের লেখায় এবং স্টোইক্স-দের বক্তব্যে। ন্যায়নীতির সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচেষ্টা করতে গিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করেছেন তাঁরা। প্রাচীন রোমের দার্শনিক সিসেরো এবং সেনেকার লেখাতেও মূলত নৈতিকদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়নীতিকে বোঝবার চেষ্টা দেখা যায়। পরে মধ্যযুগে খ্রিস্টান যাজকদের কাছ থেকেও ন্যায়নীতি সম্বন্ধে নৈতিকদর্শন ভিত্তিক মতামত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চিন্তার উল্লেখযোগ্য ফসল পাওয়া যায় সেন্ট অগাস্টাইন ও সেন্ট টমাস আকুইনাসের বক্তব্যে। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের প্রথম যুগে দার্শনিক জন লক পশ্চিম ইউরোপে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য সমাজে সম্পদ ও ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার পক্ষেই তাঁর নৈতিকদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের রূপরেখা তৈরি করেন। জন লকের চিন্তা লালিত-পালিত হয়েছিল সপ্তদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলন্ডের, অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁকে অনুসরণ করেই অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে জেরেমি বেন্থাম তাঁর উপযোগবাদ (ইউটিলি- টেরিয়ানিজম্) তত্ত্বের ব্যাখ্যান উপস্থিত করেন যা প্রায় দুশো বছর ধরে পশ্চিমি সভ্যতার নৈতিকদর্শনের ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করে। সমাজ সংগঠনে ও রাষ্ট্রিক কার্যকলাপে যে ধারণা (আইডিয়া) ও প্রতিষ্ঠানের (ইনস্টিটিউশন্) ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে শুধু তাকেই গ্রহণ করে বাকিদের বর্জন করার কথা বলেন বেন্থাম। আর সেজন্য তিনি একটি নীতি অনুসরণ করার কথা বলেন যার মর্মার্থ হল সমাজে ও রাষ্ট্রশাসনে যে নীতি গ্রহণ করলে বৃহত্তম সংখ্যার সর্বাধিক মঙ্গল (গ্রেটেস্ট গুড অব দ্য লার্জেস্ট নাম্বার) সাধন করা যাবে সেটাই হল একমাত্র গ্রহণযোগ্য নীতি।

ন্যায়নীতি থেকে সামাজিক ন্যায়নীতির (সোশাল জাস্টিস) আলোচনায় উত্তরণ ঘটে বুর্জোয়াশাসিত পুঁজিবাদী সমাজে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শিল্পবিপ্লব সমাজকে সামন্ততন্ত্রের কৃষিভিত্তিক স্তর থেকে তুলে এনে প্রচুর সম্পদসৃষ্টির রাজপথে দাঁড় করিয়েছিল

কিন্তু সেইসঙ্গে প্রচুর আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সঙ্কটেরও সৃষ্টি করেছিল। মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে অসাম্য দ্রুত বেড়ে গেল এবং অন্যায্য (আনজাস্ট) বণ্টন ব্যবস্থার শিকার হল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও জীবনযাত্রা। সুতরাং সমাজ-সচেতন দার্শনিক ও চিন্তকগণ মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই 'সামাজিক ন্যায়নীতি' সম্বন্ধে আলোচনায় আগ্রহী হতে থাকেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে কায়েম হতে থাকায় শ্রমিকশ্রেণি আর্থনীতিক দাবিদাওয়া ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে থাকে। সমাজ জীবনে কতটা ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা এবং কী পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির পাওয়া উচিত এবং ব্যক্তিরই বা কতটা দায়দায়িত্ব বহন করা উচিত এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা নৈতিকদর্শনের ও রাষ্ট্রদর্শনের চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। কোনও ব্যক্তির কাজকর্ম ন্যায়নীতিসম্মতভাবে চলছে কি-না তা বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা না হলেও কোনও সমাজ ন্যায়নীতিসম্মতভাবে চলছে কি-না তা সুস্পষ্টভাবে বলা সহজ নয়। যে সকল উদারনীতিক তাত্ত্বিক 'সামাজিক ন্যায়নীতি' সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন তাঁদের চিন্তায় এই কথাটাই প্রধান হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্রের উচিত বণ্টন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং বাজার ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ করে তোলা। এইভাবেই বণ্টন ব্যবস্থায় ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায় বলে তাঁরা মনে করেন। এই ব্যাপারে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩)। মিলের রাষ্ট্রদর্শনের চিন্তাভাবনা বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রভাবশালী ছিল।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বিষয়ে যিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁর চিন্তার মাধ্যমে পথিকৃতের কাজ করে গেছেন তিনি হলেন আমেরিকান দার্শনিক জন রল্‌স (১৯২১-২০০২)। সাম্প্রতিককালে সামাজিক ন্যায়নীতি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার আকর গ্রন্থ হল ১৯৭১ সালে প্রকাশিত রলসের **এ থিয়রি অব্ জাস্টিস**। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি সামাজিক ন্যায়নীতিসম্মত বণ্টন ব্যবস্থার মূলনীতির সন্ধান দিতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে উদারনীতিক রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন।

দুই ॥ প্রেক্ষাপট

ন্যায়নীতি তথা সামাজিক ন্যায়নীতি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা জন রল্‌স শুরু করেছিলেন ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিকে। ১৯৫৮ সালে তিনি সামাজিক ন্যায়নীতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণার একটি রূপরেখা তৈরি করেন একটি প্রবন্ধে। পরে দীর্ঘ বারো বছর এই বিষয়ে চিন্তাভাবনার ফসল হিসেবে লেখেন **এ থিয়রি অব্ জাস্টিস**।

তাঁর পুরো নাম জন বোর্ডলি রল্‌স। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মেরিল্যান্ড রাজ্যের বাল্টিমোর শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী এবং মাতা নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জন রল্‌স প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হন ১৯৪৩ সালে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময় সৈন্যবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করেন এবং সেই সূত্রে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, নিউ গিনি, ফিলিপাইনস এবং জাপানে কর্মরত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি আবার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং নৈতিকদর্শনে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময়েই ন্যায়নীতি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুবছর অধ্যাপনার পর তিনি যান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে। এখানে প্রখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিক ইশায়া বের্লিন ও স্টুয়ার্ট হ্যাম্পশায়ারের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। ১৯৫৩ সালে যোগ দেন আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে দু-বছর অধ্যাপনার পর ১৯৫৯-৬০ সালের জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে চলে আসেন ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব্ টেকনলজি-তে (এম.আই.টি)। এখানে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত থাকার পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। এখানেই ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত জন কাউলেস অধ্যাপক-পদে বৃত ছিলেন এবং পরে জেমস ব্রায়ান্ট কোনান্ট অধ্যাপক-পদ পান। ১৯৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন, কিন্তু তারপরও ১৯৯৫ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৯৯ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'ন্যাশনাল হিউম্যানিটিজ মেডাল' দিয়ে সম্মানিত করেন। জন রল্‌স ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যের লেক্সিংটন শহরে ২৪ নভেম্বর ২০০২ তাঁর বাসভবনে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

রল্‌স যখন ১৯৭১ সালে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তার আগে পর্যন্ত দর্শনচর্চার জগতে উপযোগবাদ, যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টবাদ (লজিকাল পজিটিভিজম), অভিজ্ঞতাবাদ (এম্‌পিরিসিজ্‌ম্) এবং ভাষাকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ (লিঙ্গুয়িস্টিক অ্যানালিসিস) প্রভৃতির প্রাধান্য ছিল। এই সকল দার্শনিক চিন্তার প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের আশ্রয় নেন যে একটিমাত্র নৈতিক (এথিকাল) প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সেটি হল কীভাবে একটি ন্যায়নীতিসম্মত (জাস্ট) সমাজ গড়ে তোলা যায়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই দর্শনজিজ্ঞাসার আধার হিসেবে **এ থিয়রি অব্ জাস্টিস** বইটির দু-লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যায় এবং কয়েক বছরের মধ্যে এই গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে প্রায় পাঁচ হাজার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আটলান্টিক মহাসাগরের দুই তীরের দেশগুলিতে। এর থেকে বোঝা যায় রলসের গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি ছিল।

রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বের কাঠামো তৈরি করার জন্য লক, রুসো ও কান্টের সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্য নেন। এই মতবাদের মূল কথা হল কোনও আইনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তা কতটা ন্যায়নীতিসম্মত (জাস্ট) তার ওপর এবং তার ন্যায়নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় যখন স্বাধীন মানুষ তাদের সম-অধিকারের অবস্থানে দাঁড়িয়ে সেই আইনকে মেনে নিতে রাজি হয়। অর্থাৎ কোনও আইন ন্যায়নীতিসম্মত কি-না তা বোঝা যায় যখন শুধু সংখ্যাধিক্যের (মেজরিটি) কাছে নয়, প্রতিটি ব্যক্তির কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় এই কারণে যে, আইনটির মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির এবং সেজন্য সকলের মঙ্গল (গুড) সাধন হবে বলে মনে করা হয়।

১৯৬০-এর দশকে যখন ধীরে ধীরে রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্ব গড়ে তুলছিলেন তখন তাঁকে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে দুটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রথমত, অভিজ্ঞতাবাদীরা খুব জোরে প্রচার চালিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রদর্শনের (পলিটিকাল ফিলজফি) দিন শেষ, এখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (এমপিরিকাল পলিটিকাল সায়েন্স) ছাড়া গতি নেই। তাঁদের বক্তব্য হল, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা যায় এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় এরকম উপাদানই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপপাদ্য বিষয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চায় নৈতিক মূল্যবোধের কোনও স্থান নেই, এবং রাষ্ট্রনীতির চর্চায় কিছু ধারণাভিত্তিক তত্ত্বকথার চর্বিতচর্বণ একেবারেই পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয়ত, সেই সময় সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রবল ভাবে প্রচার করা হত যে, একমাত্র মার্কসবাদভিত্তিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন সম্ভব। রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্ব ব্যাখ্যান করতে গিয়ে এই দুই চ্যালেঞ্জেরই তাত্ত্বিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, নৈতিক মূল্যবোধ (এথিকাল / মরাল ভ্যালিয়ুজ) বাদ দিয়ে সামাজিক ন্যায়নীতি বা সামাজিক মঙ্গলের ধারণা অসম্ভব। সমাজ বা রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনও তত্ত্বেরই কোনও গ্রহণযোগ্যতা থাকে না যদি তা মূল্যবোধবর্জিত হয়। আর দ্বিতীয়ত, তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বে তিনি দেখালেন যে, উদারনীতির (লিবারালিজম) সঙ্গে সমাজবাদের (সোশালিজম) সহাবস্থান শুধু সম্ভবই নয়, তা একান্তই প্রয়োজন ন্যায়নীতিসম্মত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য। তাঁর গ্রন্থে তিনি যেভাবে উদারনীতির সঙ্গে সমাজবাদের সঙ্গতি স্থাপন করেছেন সেটাই হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উদারনীতিক রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দান।

তিন ॥ উদ্দেশ্য ও চিন্তাপদ্ধতি

ন্যায়নীতির তত্ত্ব গঠনের প্রয়াসে জন রল্‌স প্রথমেই নৈতিকদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনকে উপযোগবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চান। স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬)-এর হাত ধরে উপযোগবাদের যাত্রারম্ভ এবং ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম (১৭৮৪-১৮৩২)-এর হাতে তার পরিণতি। উপযোগবাদের মতে কোনও আইনকে তখন 'ন্যায়সম্মত' বলা যেতে পারে যদি তা সমাজের সংখ্যাধিক্য অংশের 'প্রভূততম মঙ্গল'(গ্রেটেস্ট গুড) অর্থাৎ 'সর্বাধিক সুখ' (ওভারঅল হ্যাপিনেস) সাধন করতে পারে। কিন্তু ন্যায়নীতির এই ধরনের 'উপযোগী' সংজ্ঞা রলসের কাছে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কেননা উপযোগবাদ-প্রদত্ত সংজ্ঞায় সামাজিক মঙ্গল সাধনে ব্যক্তির ত্যাগস্বীকার ও সংখ্যালঘু অংশের মঙ্গলের কথা ভাবা হয়নি। আর্থ-সামাজিক সম্পদের 'ন্যায্য' বণ্টন করতে হলে ন্যায়নীতির একটি বিকল্প ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই রল্‌স চুক্তি মতবাদের দিকে চোখ ফেরান, এবং লক, রুসো ও কান্টের কাছ থেকে তাঁর নিজস্ব ধারণা গড়ে তোলার উপাদান পেয়ে যান। চুক্তি মতবাদ থেকে তিনি যে প্রধান বক্তব্যটি গ্রহণ করেন তা হল সমাজে

'সাধারণ মঙ্গল' (কমন গুড) সাধন করতে হলে শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের মতামত শুনলে চলবে না, ব্যক্তির প্রয়োজনের কথাও মনে রাখতে হবে। নীতি নির্ধারণের সময় উপযোগবাদ যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তা হল—প্রথমে প্রস্তাবিত নীতি থেকে যে সকল সামাজিক সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে সেগুলির যোগফল বের করা, তার থেকে সামাজিক খরচ (সোশাল কস্ট) বাদ দেওয়া এবং যার থেকে নিট সুফল পাওয়া যাবে সেই বিকল্প নীতি রূপায়ণ করা। বেন্থাম 'ব্যক্তির অধিকার' সম্পর্কিত ধারণাকে 'ননসেন্স অন স্টিল্টস' (বড়মাপের নির্বুদ্ধিতা) বলে উপেক্ষা করেছিলেন। অন্যদিকে, মার্কসবাদীরা 'ব্যক্তির অধিকার'-কে পুঁজিবাদীদের একটি কৌশল বলে সমালোচনা করেন। বলেন যে এই কৌশলের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের শ্রেণিস্বার্থকে মানুষের বিশ্বজনীন স্বার্থ বলে প্রচার করে বিভ্রান্তির জন্ম দেওয়া হয়। রল্‌স 'সামাজিক চুক্তি' পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করেছেন উদারনীতির রাজনীতি সম্পর্কিত ধারণার প্রতি এই দুটি বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জের (উপযোগবাদ ও মার্কসবাদ) জবাব দেওয়ার জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য হল উদারনীতিক রাজনীতির এমন রূপরেখা তৈরি করা যা লকের উদারনীতির চেয়ে বেশি সমতার (ইগ্যালিটেরিয়ানিজম) কথা এবং মার্কসবাদের চেয়ে বেশি স্বাধীনতার (লিবার্টেরিয়ানিজম্) কথা বলবে। তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বকে তিনি এমনভাবে দাঁড় করাতে চেয়েছেন যার ফলে তাঁর তত্ত্বটির সাহায্যে উপযোগবাদী ও মার্কসবাদী উভয়ের মধ্যে সুসংবদ্ধ এবং যুক্তিসিদ্ধ সংহতি স্থাপন করা হয়।

'সামাজিক চুক্তি' পদ্ধতিটি ব্যবহার করার পেছনে রলসের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হল স্বজ্ঞাবাদ বা সহজিয়া উপলব্ধিবাদ-ভিত্তিক (ইন্টুইশনিজম) চিন্তাপদ্ধতির অসারত্ব প্রমাণ করা। রলসের মতে স্বজ্ঞাবাদের দুটি প্রধান দোষ রয়েছে। প্রথমত, এই মতবাদ তার বক্তব্যকে কেন গ্রহণ করা হবে তা কোনও যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সেজন্য রল্‌স 'চুক্তি পদ্ধতি' ব্যবহার করে তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্ব গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যখন কোনও বিশেষ অবস্থায় সহজিয়া উপলব্ধির পথ ধরে দুই বা ততোধিক নীতির বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন স্বজ্ঞাবাদ কোনও পথ দেখাতে পারে না। এক্ষেত্রেও কোন্ নীতি অনুসরণ করে সমাজে ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থা আনা যায় সে ব্যাপারে 'চুক্তি মতবাদ' যথেষ্ট সাহায্য করে। একটা সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ধরে নিলে বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করতে সুবিধা হয়, বুঝতে সহজ হয় 'যোগ্যতা' অথবা 'প্রয়োজন' কোন্ মানদণ্ডে সমাজে ক্ষমতা ও সম্পদ বণ্টিত হলে ন্যায়নীতি রক্ষিত হয়। সহজিয়া উপলব্ধির পথে পরস্পরবিরোধী একাধিক সিদ্ধান্ত হতে পারে। এরকম অবস্থায় নীতি নির্ধারণের কাজে প্রয়োজন হয় রাজনীতিক তত্ত্বের। একমাত্র রাজনীতিক তত্ত্বই বলে দিতে পারে জনগণের কাছে কোন্ নীতি গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং 'সামাজিক চুক্তি' পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নীতিকে বেছে নেওয়ার কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে, আর সেই কারণেই রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্বের উপস্থাপনায় এবং একটি ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার কাজে চুক্তি মতবাদকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করেছেন।

উপযোগবাদ ও স্বজ্ঞাবাদ সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রল্‌স তাঁর চিন্তার পদ্ধতি হিসেবে চিন্তাপ্রসূত ভারসাম্যের (রিফ্লেক্টিভ ইকুইলিব্রিয়াম) পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যখন কোনও নীতি-উদ্ভূত ব্যবহার প্রক্রিয়া (প্র্যাক্টিস) মানুষের দৃঢ় প্রত্যয়ের (কনভিকশন) সঙ্গে সংঘাতে চলে যায় তখন মানুষকে তার ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির (প্র্যাকটিকাল জাজমেন্ট) সাহায্য নিয়ে একাধিক বিকল্প নিয়ে ভাবতে হয়। প্রত্যয়ের গভীরতা, নীতির মাহাত্ম্য এবং ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় অনুসৃত প্রমাণাদি ইত্যাদি সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। এই চিন্তাপদ্ধতিকে বলা হয় 'চিন্তাপ্রসূত ভারসাম্য', যার প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটল এবং আধুনিক কালে সিজউইক। একে ভারসাম্য বলা হয় কেননা নীতি (প্রিন্সিপ্ল) এবং বিচার-বিবেচনার (জাজমেন্ট) মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

এই ভারসাম্য সবসময় একরকমের থাকে না। সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের সময় পরিবেশ ও শর্তাদি নতুন ভারসাম্যের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এর চারিত্রিক পরিবর্তন হওয়াও স্বাভাবিক। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে রল্‌স বিবদমান দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্ব গঠনের কাজে এই চিন্তাপদ্ধতি মাহাত্ম্যপূর্ণ দান রেখে গেছে যার জন্য রল্‌সকে আধুনিক সমাজ দর্শনের ক্ষেত্রে অন্যতম পুরোধা বলে গণ্য করা হয়।

সামাজিক চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রল্‌স আরও কতকগুলি ধারণা আগেভাগেই ধরে নিয়েছেন তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য। তাঁর তত্ত্বকে বেশি করে যুক্তিযুক্ত ও প্রমাদহীন করার জন্য তাঁকে একাধিক ধারণা ধরে নিয়েই এগোতে হয়েছে। এইরকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল 'প্রারম্ভিক অবস্থান' (অরিজিনল পজিশন)। তাঁর কল্পিত 'প্রারম্ভিক অবস্থান' দিয়েই তিনি তাঁর ন্যায়নীতির আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। পূর্বেকার সামাজিক চুক্তি মতবাদের তাত্ত্বিকগণ যেরকম একটি প্রাথমিক 'প্রাকৃতিক অবস্থা' (স্টেট অব নেচার) কল্পনা করে নিয়ে তাঁদের যুক্তিজাল বিস্তার করে চুক্তি মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন, রল্‌স তেমনই তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বকে গড়ে তোলার জন্য এক 'প্রারম্ভিক অবস্থান' কল্পনা করে নিয়েছেন। 'প্রাকৃতিক অবস্থার' মতোই 'প্রারম্ভিক অবস্থান' কোনও ইতিহাস স্বীকৃত সমাজের অবস্থা বর্ণনা করে না। তাত্ত্বিক যুক্তির প্রথম ধাপ হিসেবে এই 'প্রারম্ভিক অবস্থান' কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রলসের মতে এই প্রারম্ভিক অবস্থানে মানুষ একধরনের 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপের' (ভেল্ অব ইগ্নরান্স) মধ্যে বাস করত। এটিও একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ধারণা (আসাম্শান) যা মেনে নিয়েই রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছেন। 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপ' বলতে তিনি একাধিক বিষয় বুঝিয়েছেন। প্রথমত, এই ধরনের ঘেরাটোপে আবৃত হয়ে থাকার অর্থ হল প্রারম্ভিক অবস্থানে মানুষের জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ এবং বিচারবুদ্ধি ছিল সীমিত। এই অবস্থায় কোনও মানুষেরই সমাজে তার

নিজস্ব শ্রেণি অবস্থান বা সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে কোনও বোধ ছিল না, তার নিজের বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধেও কোনও ধারণা ছিল না। অর্থাৎ রল্‌স ধরে নিচ্ছেন সমাজে প্রারম্ভিক অবস্থানে প্রতিটি মানুষ নিজেকে অন্য সকলের থেকে কোনও অংশে বেশি বুদ্ধিমান, শক্তিশালী বা মর্যাদাসম্পন্ন বলে ভাবতে পারত না। সেই কারণে সমাজে অজ্ঞতাপ্রসূত একধরনের পূর্ণ সাম্য অবস্থা বজায় ছিল। প্রত্যেকেই মনে করত—'আমিও যা অন্যেরাও তাই' (আই কুড বি এনিওয়ান)। সুতরাং সমাজে যারা ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ গঠনে আগ্রহ দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করেছিল তাদের কারুর মনেই সর্বজনের মঙ্গল বলতে কী বোঝায় বা তাদের নিজ নিজ মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা কেমন সে সম্বন্ধে কোনও নিজস্ব ধারণা আগে থেকে ছিল না। এইরকম এক অজ্ঞতার বাতাবরণের মধ্যে বাস করেই সামাজিক চুক্তিতে সম্মত মানুষ ন্যায়নীতির মূল বিষয় সম্বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছেছিল। রল্‌স ১৯৫৭-৫৮ সালে যখন প্রথম তাঁর ন্যায়নীতি সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করেছিলেন তখন এই 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপের' কোনও ধারণা তিনি গ্রহণ করেননি। এই ধারণাটি তিনি **এ থিয়রি অব্ জাস্টিস** গ্রন্থে প্রথম ব্যবহার করেন। কারণ তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য তিনি মানুষের মনে কতকগুলি প্রভাবকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন : যেমন, জন্মগত গুণাগুণ, উচ্চতর প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য, সামাজিক অবস্থাকে ব্যবহার করে নিজের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি করার প্রবণতা ইত্যাদি।

ন্যায্য সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে রলসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল, যারা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তারা সবাই ছিল যুক্তিশীল (র‍্যাশনাল) মানুষ, সবাই চেয়েছিল সর্বসাধারণের মঙ্গল, এবং একই সঙ্গে ছিল নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যাপারে আপসহীন। এইভাবে তাঁর ধ্যানধারণা গড়ে তুলে রল্‌স চমৎকারভাবে একইসঙ্গে মেলাতে চান লকের ব্যক্তিস্বাধীনতার ঐতিহ্য, রুসোর সাধারণ মঙ্গলের ঐতিহ্য এবং কান্টের নৈতিক ব্যক্তিত্বের ঐতিহ্য। সামাজিক চুক্তির ধারণা ছিল কাল্পনিক কিন্তু এর মাধ্যমে রল্‌স একটি সুশাসিত, সুনিয়ন্ত্রিত, ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে প্রয়োজনীয় যুক্তি সাজিয়ে নিয়েছেন এবং এইভাবে উদারনীতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে সমর্থন করেছেন।। রল্‌স এইভাবে তাঁর যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে রাজনীতিক আনুগত্যের (পলিটিকাল অবলিগেশন) উদারনীতিক আদর্শের সঙ্গে সম্পদ পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত আদর্শকে মেলাতে চেয়েছেন। রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বে ব্যক্তি ও সমাজ একই সঙ্গে উপকৃত হবে। রাজনীতিশাস্ত্রে আচরণবাদী (বিহেভিয়ারাল) তত্ত্বের বিরুদ্ধে এইভাবে রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্বে মূল্যবোধভিত্তিক (নরমাটিভ) আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মানুষকে যুক্তি-আশ্রয়ী (র‍্যাশনাল), স্বাধীনতা-প্রিয়, নৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং সে কারণে আত্মস্বাতন্ত্র্যপন্থী (অটনমাস) জীব হিসেবে মনে করেই রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্বের রূপরেখা তৈরি করেছেন। এইখানে রলসের চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ইমানুয়েল কান্টের বিশাল প্রভাব লক্ষণীয়।

এরপর রল্‌স ধরে নিয়েছেন যে, সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করার সময় মানুষ কতগুলি 'সামাজিক প্রাথমিক জিনিস' (সোশাল প্রাইমারি গুডস) লাভ করতে চেয়েছিল যাতে সেগুলির সুফল তারা ভোগ করতে পারে। এই ধরনের জিনিসের মধ্যে ছিল 'স্বাধীনতা ও সুযোগ, আয় ও সম্পদ এবং আত্মসম্মানের ভিত্তিস্বরূপ বিষয়গুলি'। এই সামাজিক প্রাথমিক জিনিসগুলি ক্ষমতা, অধিকার ও স্বাধীনতার মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে বণ্টিত হয়। রল্‌স এই জিনিসগুলোকে অন্য আর একধরণের প্রাথমিক জিনিস থেকে আলাদা করে দেখেছেন; যেমন: স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, সামর্থ্য, কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভা ইত্যাদি যেগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাদের মাধ্যমে বণ্টিত হয় না। এদের তিনি নাম দিয়েছেন প্রাথমিক 'প্রকৃতিগত জিনিস' (প্রাইমারি ন্যাচরাল গুডস)।

রল্‌স দেখিয়েছেন যে, প্রারম্ভিক অবস্থানে অজ্ঞতার ঘেরাটোপের মধ্যে বাস করে মানুষ চুক্তি করেছে এই সামাজিক প্রাথমিক জিনিসগুলি যত বেশি সম্ভব পাওয়ার জন্য। এই প্রচেষ্টায় মানুষের সাধারণ ব্যাপারে প্রজ্ঞা থাকলেও বিশেষ ব্যাপারে অজ্ঞতা ছিল। অর্থাৎ মোটামুটি সাধারণ বোধ ছিল যে, জীবনে এই জিনিসগুলির প্রয়োজন আছে, কিন্তু এগুলি কে কতটা পেতে পারে, সে ব্যাপারে বিশেষ অজ্ঞতা ছিল। অজ্ঞতার ঘেরাটোপে থাকার কারণে চুক্তিকারী মানুষেরা অন্যের স্বার্থের থেকে নিজস্ব স্বার্থকে আলাদা করে বুঝতে পারেনি; নিজেদের মধ্যে কী বিশেষ গুণ আছে সে সম্বন্ধে তাদের কোনও জ্ঞান না থাকায় দরকষাকষি (বারগিনিং) করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল তারা।

এইভাবে তাঁর যুক্তি সাজিয়ে রল্‌স বলতে চেয়েছেন যে, এইরকম বিশেষ অবস্থাতেই সমাজে যথার্থ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, কেননা এইধরনের শর্তাদি থাকার ফলে অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে উপকৃত হওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে সমাজে অসাম্যের সৃষ্টিও হতে পারে না, বাস্তব জীবনে অসম বণ্টনের ত্রুটি থেকে সমাজ রক্ষা পায়, কোনওরকমের পক্ষপাত সমাজ জীবনকে অন্যায্য পথে নিয়ে যেতে পারে না। এমনকি, সামাজিক মঙ্গল কিসে সম্ভব হবে সে নিয়েও গভীর মতানৈক্য থাকে না।

রল্‌স ধরে নিয়েছেন চুক্তিকে কেন্দ্র করে ভাবের আদান-প্রদান চিন্তাপ্রসূত ভারসাম্য পদ্ধতি অনুসরণ করেই করা হয়েছিল। এইভাবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ন্যায্য বণ্টনের নীতি নির্ধারিত হয়েছিল নৈতিক আলোচনার মাধ্যমে যার ফলে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজি হওয়ার সময় চুক্তিকারীরা ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা, পক্ষপাত দোষ এবং অন্ধ সংস্কার ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠেছিল। রল্‌স একটি উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছেন এইভাবে যে, জন্মদিনের উৎসবে কেক কাটার সময় যদি কেউ না জানে কেকের কোন্ অংশ সে নিজে পাবে তাহলে সেই ব্যক্তি খুব স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক কারণেই চেষ্টা করে যাতে কেকটির সবকটি টুকরো যতটা সম্ভব সমান হয়। এইভাবে রলসের বক্তব্য হচ্ছে, যদি চুক্তিকারীরা চুক্তিপরবর্তী সমাজ ব্যবস্থায় কে কী হবেন এবং কে কতটা ক্ষমতা ও সম্পদ ভোগ করবেন তা না জানে তাহলে প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রাথমিক জিনিসগুলোকে

যতদূর সম্ভব ন্যায্যভাবে (ফেয়ারলি) বণ্টন করার নীতিই তারা গ্রহণ করবে এবং সামাজিক জীবন সেইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে। চুক্তিটি এই কারণেই 'ন্যায্য' (ফেয়ার) হবে। সুতরাং রল্‌স শেষমেশ তাঁর ন্যায়নীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে যে, 'ন্যায়নীতি হল ন্যায্যতা' (জাস্টিস ইজ ফেয়ারনেস)।

রল্‌স-প্রদত্ত ন্যায়নীতির এই ব্যাখ্যানের মধ্যে জনকল্যাণের ধারণা সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে একটি যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। প্রারম্ভিক অবস্থানে অজ্ঞতার ঘেরাটোপে থেকে চুক্তিকারী জনগণ যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তা হল জনকল্যাণের ধারণাকে রূপ দেওয়া, সংশোধন করা এবং যুক্তির সাহায্য নিয়ে তাকে অনুসরণ করার ক্ষমতা (কাপ্যাসিটি) চুক্তিকারীদের নিজেদের হাতে রাখা। সুতরাং রলসীয় ব্যবস্থায় জনকল্যাণের কোনও নির্দিষ্ট ধারণা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ধারণাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল জনকল্যাণ সম্পর্কিত নিজস্ব ধারণা গড়ে তোলার, তদনুযায়ী কাজ করার এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করার অধিকার মানুষের হাতে থাকা একান্তই আবশ্যক। এইভাবে ন্যায়নীতি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে গিয়ে, রল্‌স মানুষের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের অধিকারকে সারগর্ভ (সাবস্টান্টিভ) নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তিনি চান ব্যক্তি মানুষের এই অধিকার অবশ্যই থাকা উচিত যার ফলে সে কী চায় বা না চায় তা ঠিক করার এবং প্রয়োজনে তার পছন্দ পরিবর্তন করার ক্ষমতা তার নিজের হাতে থাকে।

দেখা যাচ্ছে 'প্রারম্ভিক অবস্থান' সম্বন্ধে রলসের ধারণা গভীরভাবে কান্টের প্রভাবে সঞ্জীবিত। রল্‌স ব্যক্তিকে কান্টীয় ধারণায় 'নুমিনন সেলফ' বলে মনে করেন। এর অর্থ 'ব্যক্তি' হল স্বাধীন, নৈতিক যুক্তিগ্রাহী এবং আত্মস্বতন্ত্র। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে এইভাবে বর্ণনা করে রল্‌স প্রমাণ করেছেন যে, এই ব্যক্তি 'ন্যায্য' পদ্ধতি অনুসরণ করে 'ন্যায়নীতি' নির্ধারণ করে।

চার ॥ ন্যায়নীতির তত্ত্ব

ন্যায়নীতির রলসীয় ধারণাকে সংক্ষেপে বলতে গেলে রলসের কথায় তা বলা ভালো। তিনি তাঁর মূল ভাবনাকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন : সমাজে সব রকমের সামাজিক প্রাথমিক জিনিস—স্বাধীনতা এবং সুযোগ, আয় এবং সম্পদ ও আত্মমর্যাদাদানকারী বিষয়াদি—সমানভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত; আর সেগুলির অসম বণ্টন করা যেতে পারে, যদি তার দ্বারা সমাজে সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে আছে এমন এক শ্রেণির মানুষের কিছু উপকার হয়।

ন্যায়নীতির এই সাধারণ প্রাথমিক ধারণা ন্যায়নীতির কোনও পূর্ণ তত্ত্ব নয়। কেননা কীভাবে বিভিন্ন প্রাথমিক সামাজিক জিনিসগুলি বণ্টিত হবে তা সাধারণ ধারণায় বিশদভাবে বলা হয় নি। বিভিন্নভাবে তা বণ্টিত হতে পারে এবং তার ফলে বণ্টিত

জিনিস বা বিষয়গুলির মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত হতে পারে। সমাজে কোনও কোনও ব্যক্তির আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেকের স্বাধীনতা নষ্ট হতে পারে; অথবা অসম আয় থাকায় হয়তো প্রত্যেকের লাভ হতে পারে কিন্তু তার ফলে সুযোগ-সুবিধে ভোগ করার ক্ষেত্রে এমন অসম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যাতে স্বল্প আয়ের ব্যক্তিরা অসুবিধের পড়তে পারে।

এইধরনের অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য রল্‌স ন্যায়নীতির দুটি মূল নীতি এবং দুটি অগ্রাধিকার বিধির (প্রাইয়রিটি রুলস) কথা বলেছেন। তাঁর মতে সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করার সময় চুক্তিকারীরা প্রারম্ভিক অবস্থানে ন্যায্যতাই ন্যায়নীতির প্রাণ বলে যে ধারণাকে গ্রহণ করেছিল তার মূল নীতি দুটি আর দুই মূলনীতির সঙ্গে দুটি অগ্রাধিকার বিধি।

রল্‌স-কথিত ন্যায়নীতির 'প্রথম নীতি' সকলের জন্য সমান মৌল স্বাধীনতা (ইকোয়াল বেসিক লিবার্টি ফর অল) সুনিশ্চিত করতে চায়। রলসের ভাষায় নীতিটি হল এরকম : সমান মৌলিক স্বাধীনতার বিস্তৃত সামগ্রিক ব্যবস্থা ভোগ করার অধিকার প্রত্যেকের জন্য এমনভাবে সমান হওয়া উচিত যার সঙ্গে অন্য সকলের এক ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। রলসীয় ন্যায়নীতি ধারণার এই প্রথম নীতিটি উদারনীতির সারবস্তু। এই নীতি এই কথাই বলে যে, নাগরিকদের 'মৌল স্বাধীনতা'র সামগ্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে বাক্ স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করার স্বাধীনতা, অবৈধভাবে গ্রেপ্তার না হওয়ার স্বাধীনতা বা আইনের শাসনে বাস করার স্বাধীনতা। ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকার শীর্ষক অংশে এইধরণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। রল্‌স এই একটি ব্যাপারে খুব দৃঢ়ভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন যে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত না করতে পারলে ন্যায়নীতির কোনও অর্থই হয় না, তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সব সময়ই সমাজের সাধারণ মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগ করা যেন কখনওই সমাজের বৃহত্তর সাধারণ স্বার্থ ও তার মঙ্গলের পরিপন্থী না হয়। রল্‌স যখন এইভাবে তাঁর প্রথম নীতিটি ব্যাখ্যা করেন তখন স্পষ্টতই তাঁর এই মতের মধ্যে একদিকে রুসোর 'সাধারণ মঙ্গল'-এর ধারণা এবং অন্যদিকে কান্টের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'-এর ধারণা সমানভাবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবশালী হতে দেখা যায়। রলসীয় উদারনীতির এটাই সারবস্তু। তিনি সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী নন কিন্তু স্বাধীনতার খাতিরেই স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। স্পষ্টভাবে বলতে হলে বলতে হয়, অন্য কোনও কিছুর বদলে স্বাধীনতা হারাতে তিনি মোটেই রাজি নন।

রলসীয় ন্যায়নীতি ধারণার 'দ্বিতীয় নীতি'-র বক্তব্য বিষয় হল সকলের জন্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমতা (ফেয়ার ইকোয়ালিটি অব অপরটিয়ুনিটি ফর অল)। তাঁর নিজের মতে এই নীতিটির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশটি 'ডিফারেন্স

প্রিন্সিপল' নামে বিখ্যাত, রল্‌স একে 'ম্যাক্সিমিন' বিধি বলেও বর্ণনা করেছেন। বক্তব্যটি হল এই যে, সমাজে আর্থ-সামাজিক অ-সমতা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে সাধারণ যুক্তির ভিত্তিতে সমাজে সকলেই উপকৃত হয়, বিশেষ করে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ও কম সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষের উপকার হয়। তিনি এই বিধিকে 'ম্যাক্সিমিন' বলছেন, কারণ এই নীতি অনুসরণ করলে 'ম্যাক্সিমাইজেশন অব দ্য মিনিমাম' লক্ষ্যে পৌঁছন যাবে, অর্থাৎ যারা সবচেয়ে কম সুবিধা পাচ্ছে তারা সবচেয়ে বেশি সুবিধে পাবে, আর যেহেতু এই নীতির ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সুযোগ-সুবিধে ভোগের যে প্রভেদ নীতি আছে তা কিছুটা দূর করা সম্ভব হবে। সেজন্য এই দ্বিতীয় নীতিকে তিনি 'প্রভেদ নীতি' বলছেন। তাঁর মতে সামাজিক ন্যায়নীতির অর্থই হল সমাজে সুযোগ-সুবিধে ভোগের একটা নিম্নতম (মিনিমাম) মান থাকা উচিত। প্রারম্ভিক অবস্থানে সামাজিক চুক্তিবদ্ধ মানুষেরা সামাজিক প্রতিষ্ঠাগুলির এমন এক পুনরবস্থান বা পুনর্গঠন চেয়েছিল যাতে সবার পিছে সবার নীচে বসবাসকারী মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার হতে পারে। রলসের মতে সমাজ গঠনের এই প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল (স্ট্র্যাটিজি) প্রারম্ভিক অবস্থানে মানুষের পছন্দ-অপছন্দ সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণে মানসিক আদর্শ স্থাপনে সাহায্য করেছিল। রলসীয় ন্যায়নীতির এই দ্বিতীয় নীতিতে তাঁর সমাজবাদী চিন্তার প্রতিফলন হয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার বাতাবরণ যথাযথ রক্ষা করেই সমাজে এমন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন করা যেতে পারে, যার ফলে প্রত্যেকেরই, বিশেষ করে সমাজে প্রান্তবাসীদের, অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। রল্‌স যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন তা তাঁর ন্যায়নীতি ধারণার দ্বিতীয় নীতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

'প্রভেদ নীতি' (ডিফারেন্স প্রিন্সিপল)-এর দ্বিতীয় অংশে তিনি বলছেন, যাদের একই ধরনের সামর্থ্য, দক্ষতা ও গুণ আছে তাদের জীবনযাত্রার বিকাশের সুযোগ একই ধরনের হওয়াই ন্যায়সঙ্গত, কেননা কে কী ধরণের সুযোগ পাবে তা তার আয়ের পরিমাণের দ্বারা নিরূপিত হলে তা ন্যায়সম্মত হবে না। এই বক্তব্যের মাধ্যমে রলসীয় উদারনীতি ধ্রুপদী উদারনীতিকে অতিক্রম করে গেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদী উদারনীতি শুধু ব্যক্তির গুণ ও দক্ষতার মানদণ্ডে সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রল্‌স চান যাদের একই ধরনের গুণ ও দক্ষতা আছে তাদের সবার জন্য জীবন বিকাশের সুযোগ সমান করে দিতে। স্পষ্টতই এখানে গণতান্ত্রিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের (ওয়েলফেয়ার স্টেট) মতাদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মাফিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপেও তিনি রাজি যদি অবশ্য এই নীতির অনুসরণ করার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়।

রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বে এই দুই নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দুটি অগ্রাধিকারের বিধি। প্রথম বিধিতে স্বাধীনতার গুরুত্ব সুযোগের সমতার (ইকোয়ালিটি অব অপরচুনিটি) থেকে বেশি। সেইজন্য ন্যায়নীতির প্রথম নীতিটি সবসময় এবং সর্বক্ষেত্রে দ্বিতীয় নীতির তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে এবং এই অগ্রাধিকার আভিধানিক অর্থে (লেক্সিকাল) অগ্রাধিকার, অর্থাৎ এই অগ্রাধিকার কোনওভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। এই বিধি অনুসারে রলসীয় ন্যায়নীতি তত্ত্বে আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সম্পদ সমানভাবে বন্টনের চেয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নীতি অগ্রাধিকার পাবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে সম্পদ-বন্টনের নীতি গ্রহণ করা চলবে না।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার বিধিতে বলা হয়েছে সুযোগের ন্যায়সম্মত সমতা (জাস্ট ইকোয়ালিটি) বন্টন ব্যবস্থার দক্ষতার (ইফিশান্সি) চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। এখানেও প্রথম বিচার্য বিষয়টি দ্বিতীয় বিচার্য বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে। অর্থাৎ বন্টন ব্যবস্থাকে দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে ন্যায়সম্মত করতে গিয়ে কখনওই যেন সবার জন্য সুযোগের ন্যায়সঙ্গত সমতা লঙ্ঘন করা না হয়। মনে হয় রল্‌স এই দ্বিতীয় অগ্রাধিকার বিধিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন কারণ তাঁর সমসাময়িক কালে কোনও কোনও সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতায় সম-বন্টন ব্যবস্থা প্রচণ্ড আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপায়িত হওয়ার দরুণ সবার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা যায়নি। প্রশাসনের ঘোষিত উদ্দেশ্য যতই জনকল্যাণকর হোক না কেন পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসন কখনওই ন্যায়সম্মত হতে পারে না। এই বিষয়েও কোনও আপস করতে রল্‌স রাজি নন। এমনকি, তাঁর সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও একাধিক সামাজিক আন্দোলনে দেখা গেছিল যে কোন্ বক্তব্য বা নীতি ন্যায়সম্মত, আর কোন্ বক্তব্য বা নীতি ন্যায়সম্মত নয় এ ব্যাপারে কোনও যুক্তিসিদ্ধ মানদণ্ড ছিল না। সামগ্রিক সামাজিক স্বার্থসাধনের নামে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার বিরোধী ছিলেন রল্‌স।

অগ্রাধিকার বিধি সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, রল্‌স সামাজিক ন্যায়নীতির প্রশ্নটিকে কীভাবে দেখেছিলেন। তিনি রাজনীতিক আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নিজস্ব উদারনীতির বক্তব্যকে। তিনি তাঁর **এ থিয়রি অব্ জাস্টিস** গ্রন্থে উদারনীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে একই সঙ্গে উদারনীতির স্বাধীনতামুখী (লিবার্টেরিয়ান) ও সমতামুখী (ইগালিটেরিয়ান) উভয় ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি উদারনীতিক ঐতিহ্যের স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নতুন সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন। স্বাধীনতার অগ্রাধিকার মেনে নিয়েও তিনি আর্থিক সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে যতদূর সম্ভব সমতা আনার পক্ষপাতী। শুধু গুণ ও দক্ষতার দরুণ কাউকে বেশি সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার নীতিকে বর্জন করেছেন, কারণ এর ফলে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়।

রল্‌স সরাসরি কোনও রাষ্ট্রতত্ত্ব (থিয়রি অব দ্য স্টেট) তৈরি করেন নি। কিন্তু তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বে তিনি এমন ধরণের উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন যার মধ্যে সাম্যনীতির কিছু প্রতিফলন থাকবে। তাঁর মতে রাষ্ট্রের কর্তব্য শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা নয়। সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত মানুষদের প্রয়োজন মেটানোর

জন্য ন্যায়সম্মত বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্রকে তিনি একটি বিশেষ ধরণের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বলে মনে করেন যার সদস্যগণ যুক্তিবাদী ব্যক্তি এবং তাঁরা সাধারণ সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করেন। এই বিষয়ে তিনি জন লকের 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার' ঐতিহ্যের সঙ্গে জাঁ জাক রুসোর 'সাধারণ মঙ্গলের' ঐতিহ্যকে সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই কাজে ইমানুয়েল কান্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতি পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। যেহেতু রল্‌স রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির মানুষদের সাহায্য করতে চেয়েছেন, সেজন্য তাঁর রাষ্ট্রধারণাকে উদারনীতিক-গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করাই সঙ্গত হবে। এই রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্নিহিত নীতি হল মানুষের মৌল স্বাধীনতাগুলিকে (বেসিক লিবার্টিজ) সুরক্ষিত করা এবং আর্থ-সামাজিক লাভের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেওয়ার নীতি বর্জন করা। রলসীয় ন্যায়নীতির তত্ত্বে মানুষের ধারণা (কনসেপ্ট অব্ ম্যান) বলতে বোঝায় একজন নৈতিক ব্যক্তিত্ব যাঁর কাছে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব দ্রব্যের মতো স্বাধীনতাও একান্ত প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে রলসের উদারনীতি রাজনীতিক রক্ষণশীলতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে কোনও আপস বা জোড়াতালির ব্যাপার নয়। রলসীয় উদারনীতির মধ্যে যে একটি নিজস্ব সবল নৈতিকতা আছে তা হল মানবতাবাদের নৈতিকতা (এথিকস অব হিউম্যানিটেরিয়ানিজম)। তিনি সমাজের শ্রেণিবিভক্ত এবং উচ্চাবচ কাঠামোকে কার্যপ্রণালীর দিক থেকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর দাবি হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে সবার জন্য মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে। সমাজে গায়ের জোরে সাম্য প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি সৃষ্টিশীল (ক্রিয়েটিভ) ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করায় আগ্রহী এবং তাঁর মতে সে কাজ করতে হলে 'ন্যায়নীতিসম্মত' উপায়ে সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুতরাং রলসীয় রাজনীতিক উদারনীতির বক্তব্য হল 'সামগ্রিক সামাজিক মঙ্গলের' চেয়ে ব্যক্তির 'অধিকার' অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

তাঁর এ থিয়রি অব্ জাস্টিস গ্রন্থটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে উদারনীতির শিবিরের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক তাত্ত্বিক তার সমালোচনা করেছেন। ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে রল্‌স এই সব সমালোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে তিনি তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে বলেন যে, তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্ব কোনও অধিবিদ্যার (মেটাফিজিক্স) তত্ত্ব নয়, তা একটি রাজনীতিক (পলিটিকাল) তত্ত্ব।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে উদারনীতির আলোচনাকে তিনি ১৯৯০-এর দশকে আরও প্রসারিত করেন। তিনি তাঁর পলিটিকাল লিবারালিজম্ (১৯৯৩) গ্রন্থে স্বীকার করেন, যে কোনও মুক্ত সমাজে ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যুক্তিবাদী ও ন্যায়নীতিপন্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং উদারনীতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেকের কাছে আইনকে ন্যায়সম্মত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা একটি

কঠিন সমস্যা। নাগরিকদের মধ্যে কোনও সাধারণ নৈতিক বা ধর্মসম্পর্কিত ঐকমত্য না থাকলে তা করা সম্ভব নয়। এখন আর উপযোগবাদের সমালোচনা করার পরিবর্তে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন যে, বিভিন্ন নীতি ও ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নাগরিকের সকলেই 'সর্বসাধারণের যুক্তি' (পাবলিক রিজন)-নির্ভর 'ন্যায়নীতি'-র ধারণাকে সমর্থন করে। রল্‌স একধরনের 'রাজনীতিক উদারনীতি'-কে সমর্থন করেন যা উদারনীতির মৌল নীতিগুলির যে কোনও ধরণের অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র বা ধর্মের ভিত্তিকে এড়িয়ে গিয়ে অপরকে সহ্য করার নীতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। তিনি সবসময় মনে করে এসেছেন যে, 'স্বাধীনতা' ও 'সাম্য' উদারনীতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান দুটি ধারণা, কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে তিনি এই দুই নীতিকে 'রাজনীতিক' মূল্যবোধ (পলিটিকাল ভ্যালিয়ু) বলে মনে করছেন। এই দুই প্রধান নীতিকে এখন আর তিনি কোনও অধিবিদ্যা, দর্শন বা ধর্মের সামগ্রিক ধারণার অঙ্গ বলে মনে করছেন না। তাঁর মতে স্বাধীনতা ও সাম্য মূল্যবোধ দুটি তাদের নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে এবং উদারনীতিক সমাজের রাজনীতিক সংস্কৃতির (পলিটিকাল কালচার) মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে। এই মূল্যবোধগুলিকে 'সর্বসাধারণের যুক্তি' সমর্থন করে। উদারনীতিক সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য এবং অপরকে সহ্য করার নীতি (টলারেশন) কোনও নৈতিক বা ধর্মীয় যুক্তির সত্যাসত্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। এগুলি যে 'সর্বসাধারণে'র যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয় তার কারণ 'সর্বসাধারণের যুক্তি' ব্যাপারটা সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধ থেকেই সৃষ্ট হয়। এই যুক্তি রাজনীতির তর্ক-বিতর্কে ব্যবহৃত যুক্তির কাছেই আবেদন করে এবং সবসময়ই তা সাধারণের মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এইধরণের সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী যুক্তি উদারনীতিক সমাজের সকল যুক্তিবাদী মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে এবং চালনা করে। রল্‌স একেই 'সার্বিক ঐকমত্য' (ওভারল্যাপিং কনসেনসাস) বলে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং রল্‌স এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, উদারনীতিক গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষ ন্যায়নীতির সেই ধারণার কাছেই আবেদন করে যা যুক্তিবাদী, তথ্যভিত্তিক, সহযোগী নাগরিকদের রাজনৈতিক আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত করে। রল্‌স মনে করেন ন্যায়নীতি ধারণার যে দুটি নীতির কথা তিনি বলেছেন সেগুলি সকল যুক্তিবাদী মানুষ (অন্তত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে) গ্রহণ করেন, এবং তার মাধ্যমে তাঁরা রাজনীতিক যুক্তি উপস্থিত করেন।

এই 'সার্বিক ঐকমত্য' থেকেই জন্ম নেয় বহুত্ববাদী (প্লুরাল) রাজনীতির মূল্যবোধ ও চালিকা নীতি যা সকল যুক্তিবাদী নাগরিক তাঁদের নৈতিক বিশ্বাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও গ্রহণ করেন। সুতরাং রল্‌স স্বীকার করেছেন (অন্তত তাঁর আমেরিকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে) যে, যতদূর সম্ভব ন্যায়নীতির ধারণা বিবদমান দার্শনিক এবং ধর্মীয় নীতি ও তত্ত্বের ওপরে অবস্থান করা উচিত। সেজন্য দার্শনিক মতামতের ওপর স্থান হওয়া উচিত অপরকে সহ্য করার নীতির। এইভাবেই নাগরিকদের কাছে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার নীতি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তখন উদারনীতিক রাষ্ট্র দলাদলির ঊর্ধ্বে

উঠে নাগরিকবৃন্দকে তাদের সহমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত 'সর্বসাধারণের যুক্তি'র দ্বারা চালিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।

রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বের শেষ পরিণতি দেখা যায় ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর **দ্য ল অব্ পিপলস্** শীর্ষক তৃতীয় গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে দুষ্ট রাষ্ট্রের দ্বারা তার নাগরিকগণ যদি উৎপীড়িত হন এবং তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ধর্ষিত হয় তাহলে 'ন্যায়পরায়ণ ও ভদ্র' (জাস্ট অ্যাণ্ড ডিসেন্ট) জাতিদের অধিকার আছে সেখানে হস্তক্ষেপ করার। এই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, বঞ্চিত-উৎপীড়িত জাতিদের সাহায্য করা সকল রাষ্ট্রের কর্তব্য যাতে তারা ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি ও জাপানের শহরগুলিতে বোমাবর্ষণ করার নিন্দা করেছেন। বিশেষ করে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলাকে তিনি অসামরিক জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘন করার মতো অপরাধ বলে মনে করেন।

রল্‌স ২০০১ সালে তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বের সাধারণ-বোধগম্য ব্যাখ্যান প্রকাশ করেন তাঁর **জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস : এ রিস্টেটমেন্ট** গ্রন্থে। এটির কোনও নতুন তাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই।

পাঁচ ।। রলসীয় তত্ত্বের সমালোচনা

উদারনীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় শিবির থেকেই রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ তাঁর যুক্তিবিন্যাসে ত্রুটি লক্ষ করেছেন, আবার অন্যেরা তাঁর সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করেছেন। রলসীয় তত্ত্বে 'প্রারম্ভিক অবস্থান' (অরিজিনল পজিশন) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই তত্ত্বটি চুক্তিভিত্তিক (কনট্রাক্টেরিয়ান) কি-না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে কিছু সমালোচকের মনে। যুক্তির দিক থেকে 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপে'-র ধারণা নিয়ে এসে রল্‌স প্রারম্ভিক অবস্থানে সকলকেই একই ধরনের এবং অভিন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছেন। তাই যদি হবে, তাহলে তারা দরকষাকষি (বারগিনিং) করতে পারে না। ন্যায়নীতির 'দুইটি নীতি'-কে গ্রহণ করার সঙ্গে চুক্তির কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে না, আর গ্রহণীয় নীতি যদি চুক্তির ওপর নির্ভর না করে তাহলে রলসের তত্ত্বকে আদৌ চুক্তিভিত্তিক বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, রল্‌স তাঁর 'প্রভেদ নীতি' সমর্থন করতে গিয়ে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলছেন 'প্রারম্ভিক অবস্থানে' চুক্তিকারী ব্যক্তিরা নিম্নতমের (মিনিমাম) চেয়ে কতটা বেশি পেলেন সে ব্যাপারে তারা বেশি মাথা ঘামায় না। কিন্তু রলসের বক্তব্য তাঁর আগের কথার সঙ্গে পরস্পরবিরোধী, কেননা তিনি বলেছিলেন যে, প্রারম্ভিক অবস্থানে প্রত্যেকে 'সামাজিক প্রাথমিক জিনিসগুলি' যত বেশি সম্ভব পাওয়ার জন্য দরকষাকষি করে চুক্তি করেছিল। স্পষ্টতই প্রথম কথার সঙ্গে দ্বিতীয় কথার মিল নেই।

তৃতীয়ত, তিনি 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপ' ধারণাটি ব্যবহার করেছেন এই উদ্দেশ্যে যাতে

চুক্তিকারীদের মধ্যে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি ও স্বার্থ নিয়ে কোনও পার্থক্য না থাকে। অথচ এই ধরণের কোনও পার্থক্য না থাকলে প্রকৃত অর্থে কোনও চুক্তি হতে পারে না, কেননা কোনও চুক্তির প্রয়োজন বোধ হবে না। এইভাবে রল্‌স-ব্যবহৃত যুক্তি বিন্যাসের মধ্যে কিছু ফাঁক বা ত্রুটি লক্ষ করা যায়।

রলসের সিদ্ধান্ত নিয়ে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুইমতের উদারনীতিক তাত্ত্বিকগণ প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। দক্ষিণপন্থী উদারনীতিক চিন্তক রবার্ট নোজিকের রলসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল রলসীয় ন্যায়তত্ত্বে 'ব্যক্তি' অরক্ষিত রয়ে গেছে। নোজিকের মতে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োজন তার নিজস্ব সম্পত্তি বা প্রতিভাকে রক্ষা করার জন্য; সমাজের সামষ্টিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োজন হয় না। সুতরাং নোজিক চান রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত কম হয় ততই ভালো। রাষ্ট্র অভিভাবকের মতো ব্যক্তিকে দেখাশুনা করবে এই নীতি নোজিকের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যদিকে রক্ষণশীল সাম্যবাদী রোনাল্ড ডোয়ারকিন এমনভাবে সমাজের সম্পদ বণ্টন করার পক্ষপাতী যাতে প্রত্যেকে একেবারে সমান পরিমাণ সম্পদ পাওয়ার পরিবর্তে ততটুকুই পাবে যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি যেটুকু পাবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং নিজের যোগ্যতা ব্যবহার করে নিজের পছন্দমতো কল্যাণকর অবস্থায় পৌঁছতে পারবে। রলসের বণ্টন নীতি তিনি গ্রহণ করেননি।

বামপন্থা-ঘেঁষা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন রলসের সামাজিক কল্যাণের ধারণাকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে যদি বেশ কিছু লোক শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়, অক্ষরজ্ঞানহীন হয়, স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শিকার হয় এবং লিঙ্গভেদের কারণে বঞ্চিত হয়। রল্‌স ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার কাজে এসব কোনও কিছুর প্রতি নজর দেননি।

রলসের ন্যায়নীতির তত্ত্বের বক্তব্যের সবচেয়ে বড়ো সমালোচনা করেছেন কৌমবাদীরা (কমিউনিটেরিয়ানস)। কৌমবাদী শিবিরের তাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম অ্যালাসডেয়ার ম্যাকাইনটায়ার, চার্লস টেলার, মাইকেল ওয়ালৎজার এবং মাইকেল স্যান্ডেল। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রলসের সমালোচনা করেছেন, এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। উদারনীতির সঙ্গে কৌমবাদের যে বিতর্ক গড়ে উঠেছে ১৯৮০-র দশকে তা প্রধানত স্বসত্ত (সেল্ফ)-র ধারণা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা, ন্যায়নীতি প্রয়োগের সর্বজনীনতা বা বিশেষ কৃষ্টি-কেন্দ্রিকতা ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিকদর্শনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

বিশেষ কৃষ্টি-বহির্ভূত স্বাধীন সত্তার (আনএনকাম্বার্ড সেল্ফ) ধারণাকে কৌমবাদীরা তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করেছেন। কারণ, তাঁদের যুক্তি হল মানুষের স্বসত্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে তার বিশেষ কাল, স্থান ও কৃষ্টির সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত, এদের দ্বারা প্রভাবিত। গভীর আত্মসমীক্ষা ও মায়া-মমতা বোধের মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তি তার সামাজিক অবস্থান খুঁজে পায় এবং এই আত্মবোধের মাধ্যমেই তার মধ্যে সামাজিক

ন্যায়নীতির ধারণা জন্মায়। কৌমবাদীদের মতে রলসের 'ব্যক্তি' মানুষ শূন্যগর্ভ এবং রল্‌স পুরোপুরি সমাজের মাহাত্ম্য অস্বীকার করেছেন। অথচ সমাজই ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতা, তার অস্মিতা বোধ (সেন্স অব আইডেন্টিটি), তার প্রতিভা এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দেয়। সুতরাং রাজনীতিকে সবসময় নজর রাখতে হয় কিসে সমাজের সার্বিক কল্যাণ হবে। 'স্বাধীন' ব্যক্তি বলতে কোনও ধারণা সমাজতত্ত্বের অর্থে একটি অসম্ভব ধারণা। কৌমবাদী সমালোচনার আর একটি বক্তব্য হল সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের কোনওরকমের সক্রিয় ভূমিকা বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা ন্যায়নীতির কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্র (স্ফিয়ার) নেই; ন্যায়নীতিকে সমাজজীবনের রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

নারীবাদী তাত্ত্বিকরাও রলসের ন্যায়নীতির তত্ত্বকে আক্রমণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য উদারনীতিক সমাজে কখনওই নারীদের নিজস্ব প্রয়োজন ও লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামানো হয়নি, বরং নারীজীবনের লক্ষ্যকে উপেক্ষাই করা হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য থাকার ফলে সমাজ এতটাই বিকৃত হয়েছে যার জন্য কোনও ধরণের ন্যায়নীতির তত্ত্বই নারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নারীবাদী সমলোচনা একটা বিষয় দেখতে পায়নি, তা হল রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বে নারীবাদীদের কোনও কোনও প্রয়োজন মেটানোর প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

মার্কসবাদীরা রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। বলতে গেলে তাঁরা কোনও ধরনের ন্যায়নীতির তত্ত্বেই বিশ্বাস করেননা। এমন কি কার্ল মার্কস নিজেই ন্যায়নীতি সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজনই বোধ করেননি, কেননা তাঁর সমাজ বিশ্লেষণে তিনি দেখিয়েছেন যে, উদারনীতিক সমাজে কখনওই যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সমাজ বিকাশের তত্ত্ব বলতে গিয়ে মার্কসবাদ শ্রেণি সংগ্রামের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সুতরাং মার্কসবাদীদের কাছে রলসীয় নৈতিকদর্শনের কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। তাঁরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বন্দ্বমূলক বিচারেই আগ্রহী, ন্যায়নীতিসম্মত সমাজ (জাস্ট সোসাইটি) গঠনের রলসীয় প্রচেষ্টায় তাঁদের কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। সি.বি. ম্যাকফারসন মনে করেন রলসীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগকেই সমর্থন করা হয়েছে। রলসীয় ন্যায়তত্ত্বে যে 'প্রভেদ নীতি'র মাধ্যমে সমাজবাদের আভাস পাওয়া যায় তার ভিত্তি হল মুক্তবাজারভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা। সেখানে ধরে নেওয়া হয় যে, সমাজের উঁচুতলায় সঞ্চিত সম্পদের কিছু অংশ ধীরে ধীরে নীচুতলার মানুষের হাতে আসবে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও দেশেই উদারনীতির এই আর্থনীতিক বণ্টন ব্যবস্থার সাফল্য দেখা যায়নি।

ছয় ।। মূল্যায়ণ

রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্ব সর্বাঙ্গসুন্দর কি-না বা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য কি-না তা মোটেই বড়ো কথা নয়। যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল রল্‌স তাঁর এ **থিয়রি অব্ জাস্টিস** গ্রন্থ প্রকাশ করার আগে রাষ্ট্রদর্শনের বা সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সমাজের রূপরেখা নিয়ে কোনও সারগর্ভ গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা ছিল না। রাষ্ট্রদর্শন বলতে সাধারণত রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস অথবা রাষ্ট্রনীতিক ধ্যান-ধারণার ভাষ্যাভিত্তিক সংজ্ঞা নিয়ে তর্কবিতর্ককেই বোঝাত। রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বেই প্রথম স্বাধীনতা, সাম্য ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে গভীর আলোচনা করা হয় এবং সুখী, স্বাধীন, ন্যায়সম্মত সমাজ গঠনের নীতি নির্ধারণের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

রলসীয় ন্যায়নীতি তত্ত্বে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, মুক্ত-বাজারভিত্তিক, মানবিক ও সংবেদনশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে জোরালো যুক্তিবিন্যাস করা হয়েছে। এই তত্ত্বে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়ে সাম্যের পরিধি বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। উদারনীতির প্রথম প্রজন্মের যুগে সমাজে নিয়ত সম্পদ বৃদ্ধি করে এগিয়ে যাওয়ার যে আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা দেখা যায় তাকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তিত পরিবেশে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায় রলসের বক্তব্যে। সেইসঙ্গে সমাজের প্রান্তবাসী বঞ্চিত মানুষের জন্য যাতে কিছু সুযোগ-সুবিধে দেওয়া যায় এবং সম্পদের কোনও এক ধরণের সমবণ্টনের মাধ্যমে তাদের সশক্তকরণের (এম্পাওয়ারমেন্ট) ব্যবস্থা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে রল্‌স উদারনীতিকে এক সংবেদনশীল মানবিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে রলসের প্রাপ্য। উদারনীতিক গণতন্ত্রের স্বাধীনতামুখীনতার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সাম্যমুখীনতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন রল্‌স তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্বের মাধ্যমে। এই দুই তাত্ত্বিক প্রবণতাকে একটি সামগ্রিক তত্ত্বের রূপরেখার মধ্যে বাঁধতে চেয়েছেন তিনি। সেজন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 'নব সমতাবাদ' (নিউ ইগালিটেরিয়ানিজম) আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার হিসেবে জন রল্‌স বিশেষভাবে পরিচিত হন।

সাম্প্রতিককালে রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্ব রাজনীতিক উদারনীতির দার্শনিক অলোচনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং বড়ো মাপের প্রভাব ফেলেছে। কথাটা এই অর্থে সত্য নয় যে রলসের তত্ত্ব সকলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু তা এই অর্থে সত্য যে ১৯৭১ সালের পর থেকে নৈতিকদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে যা কিছু উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা গেছে তা হয় রলসীয় অবস্থানের পক্ষে অথবা বিপক্ষে। রল্‌সকে বাদ দিয়ে বা তাঁর বক্তব্যকে উপেক্ষা করে উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের চর্চা এখন অসম্ভব। তিনি তাত্ত্বিক আলোচনার যে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল রচনা করেছেন তার মধ্যে বাস করেই পরবর্তী তাত্ত্বিকগণ নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। বণ্টনের ন্যায্যতাই ন্যায়নীতির প্রাণ (জাস্টিস এ্যাজ ফেয়ারনেস) —রলসীয় এই অবস্থানে দাঁড়িয়েই গণতান্ত্রিক উদারনীতির দেশগুলিতে নীতিনির্ধারকেরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করেন। সাম্প্রতিককালে সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞান (এথিকস্) যে খুবই

প্রাসঙ্গিক তা রল্‌স্ খুব জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। সেজন্যই নোজিক থেকে ডোয়ারকিন বা সেন প্রত্যেকেই রলসের কাছে তাঁদের বৌদ্ধিক ঋণ স্বীকার করেছেন। এমনকি, কৌমবাদী সমালোচকগণও রলসীয় যুক্তিকে সামনে রেখেই তাঁদের প্রতিবাদী বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। তাঁর বামপন্থী সমালোচকগণও স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা রলসের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ গ্রহণযোগ্য মনে না করলেও রলসীয় প্রচেষ্টার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। রল্‌স তাঁর বক্তব্যে খুব সফলভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সমালোচনামূলক নৈতিকদর্শনের (ক্রিটিকাল মরাল ফিলজফি) প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ না দিলে সমাজতন্ত্রের কোনও তত্ত্বই অর্থপূর্ণ হয় না। রল্‌স-প্রবর্তিত 'চিন্তাপ্রসূত ভারসাম্য' আধুনিককালে সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিন্তা পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রলসের বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য যুক্তিবিন্যাস করতে গেলেও এই চিন্তাপদ্ধতির সাহায্য নিতে হচ্ছে। এটাই ছিল রলসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী তাত্ত্বিক দান।

রল্‌স যে সার্বিক ঐকমত্যের কথা বলেছেন তা ১৯৮০-র দশকের পর থেকে ক্রমশই বেশি করে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করছে। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ভারতে, যে ধরনের অস্মিতার রাজনীতি (আইডেন্টিটি পলিটিক্স) দেখা যাচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে রলসীয় ঐকমত্য খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে যে সতত শক্তিপরীক্ষা বিকাশশীল দেশগুলিতে শুরু হয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্য রলসের 'রাজনীতিক উদারনীতি'-র বক্তব্য খুবই প্রয়োজন। তাঁর মতে ক্যাথলিক মতবাদ, ইসলাম বা উপযোগবাদ ইত্যাদি সামগ্রিক মতবাদগুলি সম্বন্ধে যুক্তিবাদী মানুষের মধ্যে মতান্তর থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা বা সমতা ইত্যাদি রাজনীতিক মূল্যবোধগুলি নিয়ে মতান্তর কোনওভাবেই যুক্তিযুক্ত বা সমর্থনযোগ্য নয়। যে কেউ এই রাজনীতিক মূল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করবেন তাঁর অবস্থান থেকে যাবে সার্বিক ঐকমত্যের বাইরে। যুক্তি-আশ্রয়ী ঐকমত্য উদারনীতিক রাজনীতির মূলকথা।

কিন্তু রলসীয় ন্যায়নীতি তত্ত্বের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি হল ১৯৯০-এর দশকের পর থেকে নয়া-উদারনীতি নামে যে আর্থনীতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার ফলে ভারতের মতো বিকাশশীল দেশগুলিতে রলসীয় 'প্রভেদ নীতি' বা ম্যাকসিমিন নীতি একেবারেই উপেক্ষিত হয়ে পড়ছে এবং সমাজে আপেক্ষিক বঞ্চনা ক্রমশই গুরুতর আকার ধারণ করছে। সাম্প্রতিককালের 'নয়া উদারনীতি' (নিও-লিবারালিজম) রলসীয় উদারনীতিকে উপেক্ষা করছে এবং তার সমতার সুরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। সেজন্যই বর্তমানকালে রলসীয় ন্যায়নীতিতত্ত্ব ও তাঁর রাজনীতিক উদারনীতির বক্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। আজ বারেবারেই রলসীয় বক্তব্যের কাছে ফিরে যেতে হচ্ছে এবং সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য কি-না সেটা মোটেই বড়ো কথা নয়। যে কথাগুলি বিকাশশীল

জগতে ঘুরেফিরেই নীতি-নির্ধারকদের, গণমাধ্যমের নেতাদের, এমনকি চিন্তাশীল সাধারণ মানুষদের কাছে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করছে সেগুলি হল: প্রথমত, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির নৈতিকতা কখনওই দরকষাকষির বিষয় হতে পারে না; দ্বিতীয়ত, ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমানেই বেশি মাত্রায় সামাজিক সুযোগ বাড়িয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে সমাজের উপেক্ষিত-নিপীড়িত মানুষদের জন্য; আর, তৃতীয়ত, সামাজিক কৃষ্টির বহুত্ববাদী চরিত্র মেনে নিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অন্যকে সহ্য করার মানসিকতা গড়ে তোলা উচিত। দার্শনিক-তাত্ত্বিক যুক্তির সাহায্যে এই মূল কথাগুলিই বলতে চেয়েছেন বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজ দার্শনিক ও রাজনীতিক তাত্ত্বিক জন রল্‌স। এ থিয়রি অব্ জাস্টিস গ্রন্থটির গুরুত্ব বোঝাতে রলসের অন্যতম সমালোচক রবার্ট নোজিক এই গ্রন্থটিকে 'এ পাওয়ারফুল, ডিপ, সাটল, ওআইড-রেঞ্জিং, সিস্টেম্যাটিক ওয়ার্ক ইন পলিটিকাল অ্যান্ড মরাল ফিলজফি হুইচ হ্যাজ নট সিন ইটস লাইক সিন্স দ্য রাইটিংস অব জন স্টুয়ার্ট মিল' বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বক্তব্যকে 'এ ফাউন্টেন অব ইল্যুমিনেটিং আইডিয়াস' বলে স্বাগত জানিয়েছেন।

কয়েকটি প্রয়োজনীয় বই :

John Rawls, *A Theory of Justice.*
John Rawls, *Political Liberalism.*
R. Sushila, *Liberty, Equality and Social Justice: Rawls's Political Theory.*
W Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction.*
Jean Hampton, *Political Philosophy : An Introduction.*
N. Daniels (ed), *Reading Rawls.*
R.P. Wolff, *Understanding Rawls.*
S. Mulhall and A Swift, *Liberals and Communitarians.*
A Swift, *Political Philosophy.*
John Rawls, *Justice as Fairness : A Restatement.*

জনসাধারণের অবাধ ও স্বাধীন অংশগ্রহণের অবস্থাসমূহ নিশ্চিত করা। অটো খারহেইমার (Otto Kirchheimer) রাজনৈতিক ন্যায় বলতে বুঝিয়েছেন সেই আদর্শের সন্ধানকে যাতে রাষ্ট্রদেহের সকল সদস্য রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগসাধন ও আন্তঃক্রিয়ার দ্বারা এর সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ গ্রহণকে সম্ভব করে তুলবে ("The search for an ideal in which all members will communicate and interact with the body politic to assume its highest perfection")।

সাধারণভাবে, রাজনৈতিক ন্যায়ের ধারণা উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল্যবোধসমূহের প্রতি এক ধরনের অঙ্গীকারবদ্ধতাকে ইঙ্গিত করে থাকে। রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি হল ঃ

(ক) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এবং তাদের স্বার্থ ও অভাব অভিযোগের যথাযথ প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার, সরকারী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বিধিনিষেধের অনুপস্থিতি এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

(গ) জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহের পূর্ণ নিশ্চয়তাজ্ঞাপন। বিশেষভাবে মতপ্রকাশ ও সরকারী কাজকর্মের সমালোচনার অধিকারের স্বীকৃতি।

(ঘ) সংঘ ও সমিতি, স্বার্থ গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে নাগরিকদের স্বার্থের প্রকটন ও সংরক্ষণের স্বাধীনতার স্বীকৃতি।

এই ধরনের শর্তগুলির রূপায়ণ একটি উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। কাজেই বলা যেতে পারে রাজনৈতিক ন্যায় একটি পূর্ণ-বিকশিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথেই নিজেকে মেলে ধরতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদীরা মনে করেন উদার গণতন্ত্রের ভিত্তি মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। এইরূপ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক ন্যায় যথাযথভাবে কার্যকর হয় না। আর এই কারণেই উদার গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ন্যায়ও থাকতে পারে না। বিশাল সংখ্যক শ্রমজীবি ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে ন্যায়ের এই সকল বিভিন্ন দিকগুলি একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন নয়। এদের মধ্যকার সীমারেখাও নিশ্চল নয় ; বরং এদের মধ্যকার সীমারেখা পরিবর্তনশীল এবং অনেক সময়ই যা একটি ক্ষেত্রে অধীন তাকে অন্যক্ষেত্রের অধীনে স্থাপন করা যায়। আসলে এগুলি হল বৃহত্তর ও সাধারণ অর্থে সামাজিক ন্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রগত অভিব্যক্তি।

জন রলস-এর ন্যায়তত্ত্ব)
(Rawlsian Theory of Justice)

ন্যায়বিচার সম্পর্কে যে সর্বশেষ তত্ত্ব বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছে তা হল জন রলসের (John Rawls) ন্যায়বিচার তত্ত্ব। তাঁর এই তত্ত্ব তাঁকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতিমানবাচক রাজনৈতিক তাত্ত্বিকের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তিনি তাঁর ন্যায় তত্ত্বের মাধ্যমে উদারতন্ত্রের একটি বিশেষ সংজ্ঞার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং আদর্শনিষ্ঠ নীতিশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

জন রলস-এর জন্ম ১৯২১ সালে। ২০০২ সালে একাশি বছর বয়সে তিনি মারা যান। অল্পদিনের জন্য তিনি সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। তাঁর জীবনের বেশীরভাগ সময়টা কেটেছে গবেষণা ও

শিক্ষকতায়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে The Philosophical Review-তে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধ *"Justice as Fairness"*। এর পর তাঁর যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল *'Constitutional Liberty'* (1963), *'The Sense of Justice'* (1963), *'Civil Disobedience'* (1966), *'Distributive Justice'* (1967) এবং *'Distributive Justice : Some Addenda* (1968)। এই সকল প্রবন্ধগুলির পরিমার্জন, পরিবর্ধন, পুনর্বিন্যাস ও নবীকরণের পরিণতি স্বরূপ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর *'A Theory of Justice (1971)*, ১৯৯৩ সালে তাঁর দ্বিতীয় বই *Political Liberation* প্রকাশিত হয়। এছাড়া ১৯৯৯ সালে তাঁর *'The Law of Peoples'* এবং 2000 সালে তাঁর *'Lectures on the History of Moral Philosophy* প্রকাশিত হয়।

জন রলস-এর বহুচর্চিত বইটি হল *'A Theory of Justice' (1971)*। বইটি প্রকাশের সাথে সাথেই সেটি পশ্চিমী দুনিয়ার বিশিষ্ট উদার তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বইটি ৮৭টি অংশে বিন্যস্ত। এই গ্রন্থে তিনি ন্যায়ের প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য ন্যায়ের সবথেকে যথোপযুক্ত নৈতিক ধারণা কি ? এই প্রশ্নটি ন্যায় সম্পর্কিত রলস-এর চিন্তাভাবনাকে চালিত করেছে। *A Theory of Justice* গ্রন্থে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

রলস উপযোগিতাবাদী দর্শনকে প্রত্যাখান করেছেন। আধুনিক নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শন থেকে তিনি উপযোগিতাবাদের ২৫০ বছর প্রাধান্যের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। ডেভিড হিউম (David Hume) যে অভিজ্ঞতাবাদের সূচনা করেছিলেন তাকেই আরো বিকশিত করে তোলেন জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham)। রলস উপযোগিতাবাদী দর্শনের এক বিকল্প নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। রলস-এর কাছে হিউম ও বেন্থামের উপযোগিতাবাদ গ্রহণযোগ্য ছিল না। উপযোগিতাবাদ অনুসারে সেই 'আইন' হল ন্যায়সঙ্গত যা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সর্বোচ্চ সুখবিধান করে। এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে ব্যক্তি ও সংখ্যালঘিষ্ঠের হিতের বিষয়টি বিসর্জনের ধারণা নিহিত ছিল। ন্যায়সঙ্গত বন্টনের বিষয়টিও উপযোগীতাবাদীদের সমস্যার বিষয় ছিল।

উপযোগিতাবাদের অবস্থান গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু নৈতিক দর্শনে ন্যায়ের কোন বিকল্প ধারণাও গড়ে ওঠেনি। রলস তাঁর *A Theory of Justice*-এ এই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেন। এই বইতে তিনি এই বক্তব্য জোরালভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সামাজিক ন্যায় সরবরাহ করা। রলস-এর মতে Justice হচ্ছে fairness অর্থাৎ ন্যায় হল অবঞ্চনা বা সমদর্শিতা। সহজ করে বলা যায় সামাজিক ন্যায়ের অর্থ হল মৌলিক অধিকার এবং মোটামুটি সমান সুযোগ।

সামাজিক ন্যায় প্রসঙ্গে উপযোগিতাবাদের বিকল্পের সন্ধান করতে গিয়ে রলস লক, রুশো, ও কান্টের 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁদের চুক্তি সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে উদার ও গণতান্ত্রিক ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। চুক্তি মতবাদে যে প্রকৃতি রাজ্যের (state of nature) কথা রয়েছে সেই রাজ্যে সকল মানুষই ছিল সমান ও মুক্ত। সমানাধিকারের অবস্থান থেকে মুক্ত মানুষেরা যখন কোন আইনকে মেনে নেয় তখন সেই আইন ন্যায়সঙ্গত বা সঠিক। সকলেই যখন কোন আইনের সুবিধা লাভ করে তখন সেই আইন হয়ে ওঠে ন্যায্য। এ প্রসঙ্গে রলস বলেছেন ঃ "The principles of justice are] the principle that free and rational persons concerned to further their

own interests would accept in an initial position of equality as defining the fundamental terms of their association".[7]

এ প্রসঙ্গে রলস দুটি ধারণা উপস্থাপিত করেছেন—এর একটি হল 'original position' বা আদিম পরিস্থিতি এবং অপরটি হল 'veil of ignorance' বা অবিদ্যার বা অজ্ঞতার আবরণ। আদিম পরিস্থিতি বলতে রলস চুক্তিবাদী দার্শনিকগণ কথিত প্রাকৃতিক রাজ্যের ("state of nature") মতোই এক প্রকল্পিত অবস্থার (hypothetical condition) কথা বুঝিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি কোন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বোঝান নি। এই রকম অবস্থায় (যেখানে সকলেই সমান) বন্টনের যে নীতিগুলি গ্রহণযোগ্য হয় সেইগুলিই হল ন্যায়বিচারের নীতি।

এই আদিম অবস্থায় মানুষ অবিদ্যার বা অজ্ঞতা আবরণের অন্তরালে থাকে। এই অবস্থায় ব্যক্তি মানুষ তথা একটি নরগোষ্ঠী জানে না সমাজে তার স্থান, শ্রেণীগত অবস্থান অথবা সামাজিক মর্যাদা ; সে জানে না তার স্বাভাবিক প্রকৃতি দত্ত ক্ষমতা, সৌভাগ্য, দৈহিক শক্তি, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব কি হতে চলেছে। ব্যক্তি জানে না সে নারী না পুরুষ কিংবা কোন্ নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত। রলস বলেছেন ঃ "No one knows his place in society, his class, position or social status; nor does he know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength and the like.....the parties [to the contract] do not know the particular circumstances of their own society".

এই অবিদ্যার অন্তরালের অবস্থাকেই রলস আদিম অবস্থা বলেছেন। এই অবস্থায় একজন ব্যক্তি বুদ্ধিবাদী আলাপ-আলোচনাকারী (intelligent negotiator) ও যুক্তিবাদী বাহক (rational agent) হিসাবে সে নিজের স্বার্থের উন্নতি চাইবে এবং তার স্বার্থের উন্নতির জন্য সম্পদ, মর্যাদা, সুযোগসুবিধা, নৈপুণ্য, স্বাধীনতা, আত্মসম্মান ইত্যাদি বিষয়গুলি পেতে চাইবে। কিন্তু এই আদিম অবস্থায় সকলেই সমান এবং সকলেই অবিদ্যার অন্তরালে রয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় বন্টনের নীতিগুলি নির্ধারিত হলে স্বীকৃত নীতিগুলি কাউকে বঞ্চনা করবে না ও সেগুলি সমদর্শী হবে। এই অবস্থায় গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত নীতিগুলিকেই ন্যায়ের নীতি বলা হবে।

ন্যায় হল অবঞ্চনা বা সমদর্শিতা—রলস-এর ন্যায় সম্পর্কিত এই বক্তব্যের পিছনে নিহিত রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। তা হল সকল সামাজিক মূল্য যেমন স্বাধীনতা ও সুযোগসুবিধা, আয় ও সম্পদ, এবং আত্মসম্মানের ভিত্তিগুলি বা উপায়সমূহ সমভাবে বন্টন করতে হবে। অবশ্য প্রত্যেকের সুবিধার্থে এগুলির সবগুলির অথবা কোন একটির অসম বন্টন হতে পারে। কিন্তু এই নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রাথমিক সামাজিক দ্রব্য বন্টন করা হলে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই এক্ষেত্রে রলস অগ্রাধিকারের নীতি নির্ধারণ করার কথা বলেছেন।

রলস-এর মতে সামাজিক ন্যায়ের প্রধান নীতি হল দুটি। এই দুটি প্রধান নীতি হল ঃ

প্রথম নীতিঃ সকলের সমান মৌলিক স্বাধীনতা থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিরই অন্যদের সমরূপ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সবথেকে বেশি মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করার সমান অধিকার থাকবে।

দ্বিতীয় নীতি ঃ সকলের জন্য সুযোগ সুবিধার ন্যায্য সমতা (fair equality of opportunity) থাকবে। আসলে এটি হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতাগুলি বিন্যস্ত করার নীতি। এই নীতির দুটি অংশ রয়েছে।

(ক) এই নীতি অনুসারে দেখতে হয় যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলি প্রত্যেকের সুবিধার্থে বিন্যস্ত হয় এবং সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। এছাড়া এই নীতিটি যাতে ন্যায়সঙ্গত সঞ্চয়নীতির (just saving principle) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(খ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে করে সুযোগ সুবিধাসমূহের মোটামুটি সমতার অধীনে ঐ সকল অসমতার সঙ্গে যুক্ত অবস্থান ও পদগুলি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

অগ্রাধিকারের নীতি (Priority rules) ঃ ন্যায়ের এই দুটি নীতি ঘোষণার পাশাপাশি এক্ষেত্রে রলস অগ্রাধিকারের দুটি নীতি ঘোষণা করেছেন। অগ্রাধিকারের দুটি নীতির প্রথমটিকে বলা যায় স্বাধীনতার প্রাধান্যের নীতি (principle of priority of liberty)। এই নীতি অনুসারে ন্যায়ের দুটি নীতির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সকলের সমান মৌলিক স্বাধীনতার নীতিটি দ্বিতীয় নীতিটির অর্থাৎ সুযোগের সমতার নীতির উপরে স্থান পাবে। সুযোগের সমতার জন্য সকলের সমান মৌলিক স্বাধীনতাকে খর্ব করা যাবে না। অগ্রাধিকারের দ্বিতীয় নীতিটিকে ন্যায়ের প্রাধান্যের নীতি (principle of priority of justice) বলা যেতে পারে। এই নীতি অনুসারে সুযোগের ন্যায্য সমতার নীতিটি (principle of fair equality of opportunity) সকলের সুবিধাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার নীতির (The 'maximin' principle) উপরে স্থান পাবে। অর্থাৎ কুশলতা বা সুদক্ষ বন্টন ও কল্যাণের নীতির থেকে অগ্রাধিকার পাবে সুযোগের ন্যায় সমতার নীতি।

সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করার সময় ব্যক্তি কিছু সুবিধা লাভের কথা ভেবে থাকে। সে কিছু দ্রব্য পেতে চায় বা অভীষ্ট অর্জন করতে চায়। এই সব দ্রব্য দু'ধরনের ঃ প্রাথমিক সামাজিক অভীষ্ট সামগ্রী (primary social good) এবং প্রাথমিক স্বাভাবিক অভীষ্ট সামগ্রীক (primary natural goods)। প্রাথমিক স্বাভাবিক অভীষ্টসমূহের মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা, আয় ও সম্পদ এবং আত্মমর্যাদাবোধের উপায়সমূহ বা ভিত্তিসমূহ ইত্যাদি। প্রাথমিক সামাজিক অভীষ্ট সামগ্রী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা বন্টিত হয়। প্রাথমিক স্বাভাবিক অভীষ্ট সামগ্রীর বন্টন সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বন্টিত হয় না। প্রাথমিক সামাজিক অভীষ্ট সমূহ সমভাবে বন্টন করতে হবে, যদি না অসম বন্টনের ফলে যে সবচেয়ে পেছিয়ে আছে তার সুবিধা হয়। রলস বলেছেন ঃ "All social values—liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self-respect—are to be distributed equally unless and unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage". এছাড়া, রলস-এর ন্যায়তত্ত্বের আর একটি মূলকথা হল সমাজে কেউই অন্যের চেয়ে বেশি পাবেন না যদি না তাঁর এই বেশি পাওয়ার ফলে যিনি সবচেয়ে কম পাচ্ছেন তার অবস্থার উন্নতি হয়।

রলস-এর ন্যায়তত্ত্বের প্রায়োগিক দিক ঃ রলস মনে করেন সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূল কাঠামোর প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য দিয়ে তাঁর ন্যায়তত্ত্ব কার্যকর হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হল ন্যায়কে কার্যকর করে তোলার সুনির্দিষ্ট বাস্তব-ব্যবহারিক প্রতিষ্ঠান ও পর্যায়গুলি কি হবে ? রলস এ প্রসঙ্গে চারটি স্তরের কথা বলেছেন। এগুলি হল ঃ (১) সাংবিধানিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করা ; (২) সেই সম্মেলনে একটি কার্যকর ও ন্যায্য সংবিধান বেছে নেওয়া ; (৩) আইনবিভাগীয় পর্যায়ে সেই সংবিধানের

শর্তগুলিকে আইনে রূপান্তরিত করা ; এবং (৪) বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে আইন ও নিয়মগুলির প্রয়োগসাধন।

রলস নিজের ন্যায়তত্ত্বকে সাম্যভিত্তিক ন্যায়তত্ত্ব (equalitarian conception of justice) বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন অসাম্যের মূলোৎপাটনের ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। তাই তিনি প্রাথমিক অভীষ্টসমূহকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে চান যাতে করে সেগুলি সবচেয়ে যারা পিছিয়ে রয়েছে তাদের সুবিধার্থে কার্যকর হয়। সামাজিক সুবিধাগুলি বিভাজনের প্রশ্নে রলস বিশুদ্ধ পদ্ধতিগত ন্যায়ের ধারণার উপর জোর দিয়েছেন।

সমালোচনা : রলসের ন্যায়তত্ত্ব সমালোচনাও বিতর্কের উর্দ্ধে থাকে নি। ব্যাপক সাড়া জাগালেও এই ন্যায়তত্ত্বকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি এবং ন্যায় সম্পর্কে বক্তব্যসমূহ সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমেই রলস-এর ন্যায় সম্পর্কিত আলোচনার পদ্ধতিগত ও যৌক্তিক বিন্যাসগত কিছু অসংলগ্নতার কথা উল্লেখ করা যায়।

(১) স্যামুয়েল গোরোভিৎস (Samuel Gorovitz) : বলেছেন আদিম অবস্থায় রলস-এর পদ্ধতির পর্যাপ্ততা প্রশ্নাতীত নয়। অবিদ্যার আবরণ (veil of ignorance) কেন অচলকারী বা গতিহরণকারী (immobilising) হবে যার ফলশ্রুতিতে আলোচক বা মধ্যস্থতাকারী (negotiator) আদৌ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসমর্থ হবে তা বোধগম্য নয়।

(২) জাঁ হাম্পটন (Jean Humpton) রলস-এর ন্যায়তত্ত্বের যৌক্তিক বিন্যাসের দু'টি ত্রুটির উল্লেখ করেছেন :[8]

(ক) তিনি রলস-এর যুক্তি চুক্তিবাদ সম্মত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, আদিম অবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি কর্তৃক দু'টি নীতি বেছে নেওয়ার কারণের সঙ্গে চুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে যদি রলস-এর প্রকল্পিত চুক্তি-পরিস্থিতিতে দু'টি নীতির পছন্দকরণ কোন চুক্তির একটি কাজ না হয় তাহলে রলস-এর যুক্তিকে চুক্তিবাদী বলে গ্রহণ করা যাবে না।

(খ) হাম্পটনের মতে, যদি কোন ব্যক্তি তার মর্যাদা ও প্রয়োজনসমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ হয় তাহলে তার পক্ষে প্রাথমিক অভীষ্টগুলির জন্য দরকষাকষি করা সম্ভব নয়।

(৩) ব্রায়ান ব্যারীর (Brian Barry) মতে, রলস-এর ন্যায়তত্ত্ব ত্রুটিহীন নয়। তাঁর অনেক যুক্তিই হল অগভীর (unsound)। রলস বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় একই যুক্তি বারংবার উত্থাপন করেছেন। ফলে তাঁর আলোচনায় কিছুটা পরিমাণে বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর যুক্তির উপস্থাপনা এমনই যাতে করে পাঠকের পক্ষেও রলস-এর যুক্তি-ধারাকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।[9]

(৪) ব্রান্ড-এর (R.B. Brand) মতে, "আলোক প্রাপ্ত স্বার্থ চিন্তা" অর্থাৎ তথ্য ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বার্থচিন্তা সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও মতধারার সমর্থকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রলস-এর ন্যায় তত্ত্বের বিভিন্ন ধারণার সমালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু প্রাসঙ্গিক সমালোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।[10]

(ক) বিশিষ্ট রক্ষণশীল উদারবাদী রবার্ট নজিক (Robert Nozick) রলস-এর সমালোচনা করে বলেছেন যে রলস-এর ন্যায়তত্ত্ব লক্ষ্য হিসাবে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা চায় তার নিজের জন্য। অথচ রলস ব্যক্তিসমূহ ও তাদের মেধাকে করে তুলেছেন সমষ্টিগত উদ্দেশ্য

সমূহের সাধক।

(খ) চার্লস টেলর (Charles Taylor), অ্যালাসডেয়ার ম্যাকিনটায়ার (Alasdair Macintyre), মাইকেল ওয়ালজার (Michael Walzer), মাইকেল স্যান্ডেল (Micheal Sandel) প্রমুখ 'communitarian' নামে পরিচিত কৌমবাদী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন কারণে রলস-এর ন্যায়তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। যেমন স্যান্ডেল বলেছেন একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের গঠনকারী উপাদান হল এক গভীর সমষ্টিগতবোধ (a sense of deep comunality)। এই বোধ আত্মোপলব্ধি ও ভালবাসার অংশীদারত্বের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্যান্ডেলের মতে রলস এই বিষয়টি খেয়াল করেননি। এছাড়া সম্প্রদায়বাদীগণ ('Communitarians') রলস কর্তৃক 'শূন্যগর্ভ' ব্যক্তির উপর অব্যাহত গুরুত্ব আরোপ এবং একই সঙ্গে বন্টনমূলক ন্যায়ের যে মূল জায়গা—"সম্প্রদায়" তাকে উপেক্ষা করার জন্য তাঁর সমালোচনা করেছেন।

(গ) নারীবাদীরা (feminist) রলস-এর ন্যায়তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। তারা একে দেখেছেন উদারনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ প্রকাশ হিসাবে, কিন্তু তাঁদের মতে উদারনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের লক্ষ্য ও প্রয়োজন সমূহের পক্ষে সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত এবং প্রগাঢ়ভাবে ক্ষতিকর। কাজেই নিপড়ীনের বিদ্যমান ব্যবস্থাসমূহের উচ্ছেদসাধন ছাড়া ন্যায়ের কোন তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(ঙ) মার্কসবাদীগণ রলস-এর অথবা অন্য ন্যায়তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। মার্কস ন্যায়ের ধারণা এবং সেই ধারণার পিছনে নিহিত নৈতিক সমতার ধারণার বিরোধী ছিলেন। মার্কসবাদীগণ মনে করেন রলস-এর সমালোচনামূলক নৈতিক দর্শন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং শ্রেণীসংগ্রামের মতাদর্শগত কাঠামোর দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। নরম্যান ব্যারী Norman P. Barry-এ প্রসঙ্গে বলেছেন : "Moral system can be understood only in the context of class relationship and systems of ownership". মার্কসবাদীগণ মনে করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে ন্যায়ের নীতিসমূহ প্রদর্শিত হতে পারে এই ধারণা ভ্রান্ত।

মূল্যায়ন

রলস-এর ন্যায়তেত্ত্ব একটি বিমূর্ত তত্ত্বায়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রলস এটি অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের বিমূর্ত তত্ত্বের আদলে গড়তে চেয়েছেন। এই বিমূর্ত ন্যায়তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধীনতা ও সাম্যের এক আদর্শ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই ন্যায় তত্ত্বের মধ্য দিয়ে এক ধরনের সমতাবাদী উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণাই সমর্থিত হয়েছে। তিনি নয়া-সমতাবাদের সাথে উদারনৈতিকতার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। তবে তাঁর বক্তব্যের ভুল-ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক না রাষ্ট্র চিন্তার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রভাবকে লঘু করে দেখা যায় না।

References :

1 E. Barker, *Principles of Social and Political Theory*, p. 98
2 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১০১
3 একই গ্রন্থে, উদ্ধৃত পৃ. ১০১
4 Palmer and Perkins, *International Relations*, Houghton Moffin Co., Boston, USA, p. 272
5 Plato : *Republic*, Book IV, p. 433-B. Jowett's Translation.
6 E. Barker, *Principles of Social and Political Theory*, p. 119.